কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 08 SEP 2015

পৃষ্ঠা ... ১৪ কলাম ...

সাক্ষরতা দিবস এবং ভাবনা-দুর্ভাবনা

এ এন রাশেদা

সরকার স্বয়ং বেতন স্কেলে শিক্ষক সমাজকে অবমূল্যায়িত করে যেভাবে অপমান করছে—শিক্ষার আর কিছু রইল কি? তাই সাক্ষরতা শুধু অক্ষরজ্ঞান দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না। খুদা কমিশনের রিপোর্টের ভাষায়, 'তাদের বোঝাতে হবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মূল বক্তব্য কী? এবং কেন আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে এগুলোর প্রতিষ্ঠা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।' বর্তমান সাক্ষরতা দিবসে বিবেকবান, কর্তব্যনিষ্ঠ, দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যাঁরা দেশ গড়তে চান, তাঁদের নতুন করে ভাবতে হবে এবং একযোগে কাজ করতে হবে

১৯৬৫ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেসকো ৮ সেপ্টেম্বরকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৬৬ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী এই দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তাকে বেশি বেশি করে অনুধাবনের জন্য এবং তা প্রচারের জন্য ইউনেসকোর এই ঘোষণা। একইভাবে ৫ অক্টোবর পালিত হয় বিশ্ব শিক্ষক দিবস। বাংলাদেশে ১৭ সেপ্টেম্বরকে 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে পালন করা হয় ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রতিবাদে সেদিন ছাত্রসমাজ গর্জে উঠেছিল। প্রাণ দিয়েছিলেন মোস্তফা, বাবুল ওয়াজিউল্লাহসহ কয়েকজন।

ধরা হয়, দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য শিক্ষাই হচ্ছে প্রধান অবলম্বন। তাই সমাজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত যারা; তাদের সাক্ষররূপে গড়ে তোলার প্রয়াসই হলো সাক্ষরতা। সাক্ষরতা শুধু নাম স্বাক্ষর করতে শেখা নয়। সাক্ষরতা হতে হবে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হয়ে প্রতিদিনের পত্রিকার পাতা থেকে তাদের ভালোমন্দের খবর রাখতে পারা, তাদের হিসাব রাখতে পারা এবং ঠগবাজদের হাত থেকে নিজেদের ও সমাজের অপরাপরকে রক্ষা করতে পারা। ১৯৭১ সালে বিজয়ের অব্যবহিত পরই দেশব্যাপী অনেক নৈশ স্কুল, বৈকালিক স্কুল গড়ে উঠেছিল যুবক ও মহিলাদের উদ্যোগে। দেশ গড়ার মহান ব্রত হিসেবে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেদিন মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশু শিক্ষা' ও স্লেট-পেনসিল নিয়ে।

১৯৬১ সালের গণনা অনুযায়ী সে সময়ে দেশে শিক্ষিতের হার ছিল ২১.৫ শতাংশ। তাই বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তোলার নানা ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে অনুভূত হলো দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য শিক্ষাব্যবস্থাকে আরো উন্নত ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে তোলার জন্য একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার। ২৬ জুলাই ১৯৭২ বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদাকে প্রধান করে গঠন করা হলো মোট ১৯ সদস্যের শিক্ষা কমিশন। ১৯৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদ্দীপনাময় উদ্বোধনী ভাষণে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য কমিশনের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করলেন। ১৯৭৪ সালের ৩০ মে কমিশন সমগ্র দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় যে রিপোর্ট প্রদান করে, তা-ই পরিচিতি পায় 'খুদা কমিশন রিপোর্ট' নামে। সেই রিপোর্টের ২৩ নম্বর অধ্যায়টি ছিল 'নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা'।

কমিশন উপলব্ধি করল যে দেশের ৮০ শতাংশ মানুষকে নিরক্ষর রেখে সামাজিক অগ্রগতি বা অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর নয়। তাই সব মানুষের জন্য সমাজ তৈরির লক্ষ্যেই তারা নীতি প্রণয়ন করে। সেখানে আধুনিক যান্ত্রিক চাষাবাদের মাধ্যমে কৃষি বিপ্লব ঘটানোর লক্ষ্যে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণিকে সাক্ষর করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়। তারা উল্লেখ করে যে নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলার মধ্যেই কেবল বয়স্ক শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়। তাই তাদের বুঝতে হবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মূল বাণী এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এগুলোর প্রতিষ্ঠা কেন গুরুত্বপূর্ণ, তা-ও তাদের জানতে হবে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে আমরা পেছনে যাত্রা করি। 'এডুকেশন ওয়াচ' গবেষণা সংস্থা ২০০২ সালে একটি জাতীয় স্যাম্পল জরিপে বাংলাদেশে কার্যকর সাক্ষরতার হার দেখিয়েছে ২০ শতাংশ। অথচ আমাদের এমন হওয়ার কথা ছিল না। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় ১৯২৬ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ১৩ বছরে সাক্ষরতার হার ৫৭ থেকে ৮৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল আর কিউবায় এক বছরে সাক্ষরতার হার ৯৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল।

খুদা কমিশন রিপোর্টে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে গণ্য করে ১৯৮০ সালের মধ্যে সর্বজনীন করার কথা বলা হয়েছিল। এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ ও শিক্ষাঙ্গনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছিল।

দেশকে গড়ে তোলার কী অদম্য স্পৃহা ছিল এই খুদা কমিশনের। মানুষের কর্ম-উদ্যোগ ও কর্তব্যনিষ্ঠা এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর আদর্শ ছাড়া এই বিপুল কর্মযজ্ঞ সমাধা করা যায় না। সেখান থেকে বাংলাদেশের পশ্চাদপসরণ ঘটেছে ১৯৭৫ সালের মধ্য আগস্টে। বর্তমানে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আছে। তাদের তো কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নেরই কথা ছিল। সে কারণে তারা দুই টার্ম ক্ষমতা গ্রহণ করে তিনটি শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য কমিটি করেছিল—একটি ২০০০ সালে কণ্ঠভোটে পাস হয়েছিল, অন্যটি ১৯৯৭ সালে প্রফেসর শামসুল হকের নেতৃত্বে ছিল। সে কথাটি মন্ত্রণালয় উচ্চারণই করে না। পরবর্তী সময়ে প্রফেসর কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে কমিটি গঠিত হয় এবং তা ২০১০ সালে সংসদে গৃহীত হয়। এযাবৎ বহু প্রকল্প গৃহীত হয়েছে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে। শোনা গিয়েছিল লালমনিরহাট শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন করেছে। পরবর্তী সময়ে দেশব্যাপী এসব নানা প্রকল্পের টাকা লুটপাটের কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। আজ যেকোনো পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম দুর্নীতির কারণে স্থবির হয়ে পড়েছে, তা নিয়মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই হোক বা অনিয়মিতই হোক বা বয়স্কদের হোক। দেশ আজ নৈতিকতার চরম সংকটে পড়েছে। স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যা বেড়েছে; কিন্তু ঝরে পড়ার হারও অতিরিক্ত। সর্বত্র লুটপাট, ফেরেববাজি ও অন্যকে ঠকানো। বর্তমানে সরকার আজ নিজেই সে ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। শিক্ষা কর (ট্যাক্স) বসিয়ে সরকার নিজেই শিক্ষাকে পণ্য বানিয়ে ফেলেছে। আবার তেল-গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করে একজন ভোক্তাকে দুইবার জবাই করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সরকার নিজেই রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকায় নেমেছে। তাই মুক্তিযুদ্ধে মানুষের যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য শিক্ষাকে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া, সে আকাঙ্ক্ষা আজ ধুলায় মিশ্রিত হয়েছে। রাষ্ট্র আজ মানুষকে লুটেরা শ্রেণিতে পরিণত করেছে; যার নমুনা বঙ্গবন্ধু নিজেই সে সময়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তার নমুনা আমরা বঙ্গবন্ধুর অনেক ভাষণেই পাই। যেমন ১৯৭৪ সালের ১৮ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণের একপর্যায়ে বঙ্গবন্ধু বলছেন, 'আজ...আমাদের একটা কথা মনে রাখা দরকার।...মানুষ অর্থের জন্য এত পাগল হয়েছে কেন? শুধু টাকা কামাই করবে কী করে এই চেষ্টা। একদিন হাসতে হাসতে বললাম যে বাংলার কৃষক, বাংলার দুঃখী মানুষ এরা কিন্তু অসৎ নয়। স্মাগলিং করে কারা? যারা বেশি লেখাপড়া করেছে, তারা করে। হাইজ্যাকিং...ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলিং তারাই করে। বিদেশে টাকা রাখে তারাই। আমরা যারা শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, ওষুধের মধ্যে ভেজাল দিয়ে বিষাক্ত করে মানুষকে খাওয়াই তারাই। নিশ্চয়ই গ্রামের লোক এসব পারে না, নিশ্চয়ই আমার কৃষক ভাইয়েরা, শ্রমিক ভাইয়েরা পারে না। পেটের মধ্যে যাদের বুদ্ধি বেশি আছে, তারাই ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার হয়। আর বিদেশি এজেন্ট কারা হয়?...আমরা যারা লেখাপড়া শিখি, গাড়িতে চড়ি, বিদেশে যেতে পারি, বিদেশিদের সাথে মিশতে পারি,...ভালো স্যুট পরতে পারি—তারাই বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে বিদেশিদের এজেন্ট হই।' ১৯৭২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত যারাই দেশ পরিচালনা করেছে, নৈতিকতার দিক দিয়ে তারা জাতির সামনে কোনো মাইলফলক স্থাপন করতে পারেনি। অতীত ও বর্তমান সময়ে সরকারদলীয় যেসব দানব সৃষ্টি হয়েছে, তারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অর্থ-সম্পদ লুট করে যেভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করেছে, নিঃস্ব করেছে, শিক্ষক যেভাবে লাঞ্ছিত হচ্ছেন এবং সরকার স্বয়ং বেতন স্কেলে শিক্ষক সমাজকে অবমূল্যায়িত করে যেভাবে অপমান করছে—শিক্ষার আর কিছু রইল কি? তাই সাক্ষরতা শুধু অক্ষরজ্ঞান দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না। খুদা কমিশনের রিপোর্টের ভাষায়, 'তাদের বোঝাতে হবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার মূল বক্তব্য কী? এবং কেন আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে এগুলোর প্রতিষ্ঠা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।' বর্তমান সাক্ষরতা দিবসে বিবেকবান, কর্তব্যনিষ্ঠ, দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যাঁরা দেশ গড়তে চান, তাঁদের নতুন করে ভাবতে হবে এবং একযোগে কাজ করতে হবে।

লেখক : সাবেক অধ্যাপক, নটর ডেম কলেজ